জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৯, পৃঃ ১৪৩-১৬৪
২০১৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মেথর সম্প্রদায়ের আত্মপরিচিতি নির্মাণ, অশুচিতার প্রতিরোধ ও পুনরুৎপাদিত নিম্নবর্গ

হাবিবা সুলতানা*

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দলিত প্রত্যয়টির অবতারণা উন্নয়ন ডিসকোর্সের[১] মাধ্যমে। যাদেরকে দলিত বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তাঁরা নিজেদের আত্মপরিচয় নির্মাণে দলিত প্রত্যয়টিকে কতটা আত্মস্থ করেছে, তাদের নিম্নবর্গীয় অবস্থান থেকে তাঁরা তাদের ওপর আরোপিত দলিত পরিচিতিটি কীভাবে গ্রহণ কিংবা বর্জন করছে, অস্পৃশ্যতার ভাবাদর্শ তাদের চৈতন্যে কী প্রভাব ফেলেছে - এইসব জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার প্রয়াস রয়েছে এই প্রবন্ধে। সেই সাথে নিম্নবর্গের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও ভাবাদর্শের যে উপাদানগুলি তাদের অধস্তনতা পুনরুৎপাদন করছে, সেগুলি অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাও এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। গ্রামশির মতে, নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল এরা হেজেমনিক শ্রেণি থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলি নিজেদের অপ্রবল মূল্যবোধের সাথে মিশিয়ে গ্রহণ করে। ফলে এরা প্রবল শ্রেণির কিছু উপাদান গ্রহণ করে আর কিছু উপাদান বর্জন করে। পরিবেশ থেকে ব্যক্তি যে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করে, তাকে কমনসেন্স বা সাধারণবোধবুদ্ধি বলা যেতে পারে। সেই অর্থে, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ থেকে নেয়া দৃষ্টিভঙ্গিই ঠিক করে দেয় তাঁদের সাধারণ বোধবুদ্ধি। একদিকে নিজেদের সাধারণবোধবুদ্ধি অন্যদিকে প্রবল শ্রেণির হেজেমনি, এই দু'টির সমন্বয়ে তাদের চৈতন্য দ্বৈততা পায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রভুত্বকারী শ্রেণির চেতনার সমগ্রতা ও সক্রিয় ইতিহাসবোধের সাথে তুলনা করলে কৃষক (নিম্নবর্গ) চেতনা নিতান্তই খন্ডিত এবং পরাধীন। নিম্নবর্গের ভাবাদর্শে রয়েছে সমন্বিত চেতনার অভাব, সেইসাথে নিম্নবর্গের ভাবাদর্শে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা। গ্রামশির তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে লেখা এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে ভাবাদর্শ আর জীবনবোধের কী কী উপাদান নিম্নবর্গের চেতনায় দ্বৈততা সৃষ্টি করে, যৌগ বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করে এবং সেই সাথে তাদের অধস্তনতা সুসংহত

---

* সহকারী অধ্যাপক , নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ।
ই-মেইল: habiba2351@gmail.com

করে। এই প্রবন্ধে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, উন্নয়ন ডিসকোর্স আরোপিত দলিত প্রত্যয়টি মেথর সম্প্রদায় গ্রহণ করে না। তাঁরা পরিচিতি খোঁজে জাতিগত, পেশাগত ও সম্প্রদায়গত পরিচয় থেকে। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় তাঁরা প্রবল গোষ্ঠীর কাছে অস্পৃশ্য। এই অস্পৃশ্যতার প্রতি ভাবাদর্শের জায়গায় তাদের নীরব প্রতিরোধ রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিরোধ তাদের নিম্নবর্গীয় অবস্থার পরিবর্তন করে না, কারণ তাদের চৈতন্যে রয়েছে দ্বৈততা। জাতিগত বিভক্তি, সীমিত চাকুরির ও বাসস্থানের প্রতিযোগিতা তাদের ভাবাদর্শে সমন্বিত চেতনার জন্ম দিতে পারেনা। এর ফলে অধস্তনতা পুনরুৎপাদিত হয়।

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশটিতে আলোচনার বিষয়বস্তু হল দলিত কীভাবে নিম্নবর্গ হয়ে ওঠে এবং দলিত প্রত্যয়টি কীভাবে উন্নয়ন ডিসকোর্সে জায়গা করে নিয়েছে সেই বিষয়টি। এর পরবর্তী অংশে দেখানো হয়েছে মেথর সম্প্রদায় দলিত নামকরণটি কীভাবে গ্রহণ কিংবা বর্জন করছে; অস্পৃশ্যতার ভাবাদর্শ তাঁদের চৈতন্যে কীভাবে সম্মতি এবং প্রতিরোধের জন্ম দিচ্ছে সেই বিষয়টি। প্রবন্ধের শেষ অংশটিতে মেথর সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয় অবস্থার জন্য যৌগ বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির বাধা, জীবিকার অনিশ্চয়তা এবং জাতিগত বিভাজনের প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

নিম্নবর্গ হিসেবে দলিত

রাজনৈতিকভাবে গ্রামশির 'নিম্নবর্গীয়' মানুষ তাঁরাই যারা স্বাধীন বা স্বায়ত্তশাসিত (Autonomous) রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। স্মিথের মতে, গ্রামশি এই প্রত্যয়টিকে আরো বৃহৎ পরিসরে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই যে মানুষ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানে আছেন তিনিও নিম্নবর্গের মানুষ হতে পারেন। মার্কাস গ্রীন দাবি করেন গ্রামশি সাবলটার্ন শ্রেণি (Subaltern Class) ও সাবলটার্ন গোষ্ঠী (Subaltern Group) এই দুই প্রত্যয়কে নানান সময়ে আন্তঃপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যবহার করেছেন (Interchangeably) । সাবলটার্ন স্টাডিজেও নিম্নবর্গের উল্লেখ রয়েছে। মূল ধারার ইতিহাসে স্থান পায় উচ্চবর্গের দ্বন্দ্ব। এই ধারার ইতিহাসকে সমালোচনা করে সাবলটার্ন স্টাডিজ নামক প্রবন্ধ সংকলন নিম্নবর্গের ইতিহাসের দিকে মনোনিবেশ করেছে। এই প্রজেক্টের অন্যতম উদ্যোক্তা রনজিৎ গুহ। তাঁর মতে সাবলটার্ন স্টাডিজ গ্রুপ নিম্নবর্গ বলতে দক্ষিণ এশীয় সমাজের অধস্তনদের বুঝিয়েছেন, এঁদের সামাজিক অধস্তনতা শ্রেণি, বর্ণপ্রথা, বয়স, লিঙ্গ, দপ্তর কিংবা অন্য যে-কোনো কিছুর ভিত্তিতে হতে পারে। নিম্নবর্গের ইতিহাসে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, গ্রামশি সাবলটার্ন শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। এক অর্থে পুজিঁবাদী সমাজের শ্রমিক শ্রেণি সাবলটার্ন। অন্য অর্থে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ায় হেজেমনিক শ্রেণির বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত অধীন শ্রেণিই সাবলটার্ন। জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্য মানুষজনকে পরিচয়

করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ড. বি আর আম্বেদকর ব্রিটিশ শাসনামলে দলিত প্রত্যয়টিকে জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন[২]। সামাজিক স্তরবিন্যাসে দলিত অস্পৃশ্য, নীচু জাতি। এরা মানবেতর (Less than human), নিপীড়িত এবং অসম্পূর্ণ। দলিত নামকরণটির মধ্যেও তাঁদের প্রান্তিক অবস্থার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। দলিত অর্থ ভগ্ন, নিষ্পেষিত। অস্পৃশ্যতার কারণে দলিত সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অধস্তন। তাই এই অর্থে দলিত শ্রেণি সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গ।

উন্নয়ন ডিসকোর্সে দলিত

দলিত প্রত্যয়টির আবির্ভাব আমাদের সামনে একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক চিত্রের প্রতিফলন উপস্থিত করে। ১৯৯০ সালের আগে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের স্বীকৃতি অর্জিত হয়নি। জাতিসংঘের বর্ণবৈষম্য বিলোপ বিষয়ক চুক্তিতে বর্ণবৈষম্য বলতে নরগোষ্ঠী, গাত্রবর্ণ এবং জাতিসত্তা ভিত্তিক উৎপত্তির ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট পার্থক্য, বর্জন, সীমাবদ্ধতাকে বোঝানো হয়। একইসাথে এসমস্ত অসমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা প্রকাশ্য জীবনে সমঅধিকার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতাগুলোকে বর্ণবৈষম্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ভারত সরকার সে সময়ে যুক্তি দেখায় যে বর্ণবৈষম্য বিলোপ বিষয়ক চুক্তি শুধুমাত্র নরগোষ্ঠীভিত্তিক বৈষম্যের জন্য প্রযোজ্য, ভারতীয় সমাজে যেহেতু নরগোষ্ঠীভিত্তিক বৈষম্য নেই তাই সেখানে এটির কোন প্রাসংগিকতাও নেই। ভারত সরকার জাতিবর্ণ ভিত্তিক বৈষম্যকে বর্ণবৈষম্যের আওতামুক্ত রাখতে চেয়েছিল। ১৯৯৬ সালে দলিত একটিভিস্টদের চাপে, বর্ণবৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কমিটি মন্তব্য করে যে তালিকাভুক্ত জাতিবর্ণ ও আদিবাসীরাও জাতিসংঘের বর্ণবৈষম্য বিলোপ বিষয়ক চুক্তির আওতায় পড়েন। ২০০০ সালে, জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রচার ও রক্ষা সংক্রান্ত উপ-কমিশন- পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব করে। ২০০৯-এ জাতিসংঘে পেশা ও জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তাবিত হয়। এই নীতিমালায় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বৈষম্যকে জন্ম ও পেশা ভিত্তিক বৈষম্য বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণবৈষম্য রোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ বাংলাদেশ রাষ্ট্রকেও সেই দায়িত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (১) ধারায় নরগোষ্ঠী, জাতিবর্ণ, ধর্মীয় মতবাদ কিংবা ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সংস্থাগুলি দলিত ইস্যুতে কাজ করতে শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালের পর থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজের পরিসরে দলিত বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়।

২০০২ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ দলিত মানবাধিকার। ২০০৮ এ বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত অধিকার আন্দোলন যাত্রা শুরু করে। অন্যদিকে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ দলিত (রিব) এ বিষয়ে গণগবেষণা শুরু করে। বেশ কিছু সংস্থা যেমন ফেয়ার, পরিত্রাণ, দলিত, ভূমিজ ফাউন্ডেশন, হরিজন ঐক্য পরিষদ, নাগরিক উদ্যোগ, দলিত নারী ফোরাম ইত্যাদি এখন এই বিষয় নিয়ে কাজ করছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দলিত বিষয়ক যে জোটগুলি গঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বি ডি ই আর এম, বাংলাদেশ অন্ত্যজ নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ দলিত পরিষদ, বাংলাদেশ দলিত ফোরাম অন্যতম। দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, চাকুরিক্ষেত্রে কোটার ব্যবস্থা করা, দলিত শিশুদের শিক্ষা, স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়গুলি উন্নয়ন ডিসকোর্সে জায়গা করে নেয়। বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত অধিকার আন্দোলন বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, বর্ণ-বৈষম্য বিরোধী সচেতনতা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক এজেন্ডার সাথে দলিত জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভারতে প্রচলিত দলিত প্রত্যয়টির সাথে বাংলাদেশের দলিতের কিছু পার্থক্য রয়েছে। দীপঙ্কর গুপ্তার মতে, ভারতের দলিত রাজনীতি হিন্দুত্বকে প্রতীকীরূপে অস্বীকার করে। তাঁরা এটি করে দুই প্রকারে। প্রথমত, তাঁরা নিজেদের উৎপত্তিগতভাবে ক্ষত্রিয়দের (উঁচু বর্ণ) সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করে। দ্বিতীয়ত, তাঁরা হিন্দুত্বকে প্রত্যাখ্যান করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশের দলিত আন্দোলনে রাজনৈতিক মুক্তির প্রচেষ্টার নজির পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দলিত প্রত্যয়টি সামনে আসে উন্নয়ন ডিসকোর্সের মাধ্যমে। তাই দলিত প্রত্যয়টি পরিচিত করানোর ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংস্থাগুলির অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে উন্নয়ন সংস্থাগুলির এই বিষয়ে আগ্রহী হবার পেছনে কতগুলি বিষয় কাজ করে। প্রথমত, দেশের এবং দেশের বাইরের দাতাগোষ্ঠী এই খাতে অর্থায়ন করছে। দ্বিতীয়ত, দলিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি টার্ম। বঞ্চিত ও নিস্পেষিত জনগোষ্ঠীকে দলিত প্রত্যয়টির আওতায় নিয়ে এলে পরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যাপারটি নিশ্চিত করা যায়। এছাড়া দলিত শব্দটির প্রসারতাও ব্যাপক, তাই একটি বৃহৎ নিস্পেষিত জনগোষ্ঠীকে অনায়াসেই দলিত বলা যেতে পারে। সেই অর্থে একটি বড় জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে যেহেতু দলিত প্রত্যয়টি পরিচিত, সেকারণে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরির ক্ষেত্রেও দলিত প্রত্যয়টির ব্যবহার সুবিধাজনক। বাংলাদেশে যাদেরকে দলিত বলা হয় তাঁরা জাতিগত কিংবা পেশাগত কোনোভাবেই সমগোত্রীয় গোষ্ঠী নন। এমনকি ধর্মীয় দিক থেকেও এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠী বলতে যাদের বোঝানো হয় তাঁরা হলেন : হরিজন, ডোম, মেথর, নাপিত, মালা, মাদিগা, লালবেগী, বাল্মীকি, জলদাস, কুমার, তেলি, হাজাম, কসাই, বেদে, শব্দকর, কানপুরী, তেলেগু, বাঁশফোর, ঋষি, কাওরা,

বেহারা, জেলে, দাই, ধোপা, শিকারী, বুনো ইত্যাদি। ১৬০৮ সালে ঢাকা রাজধানী হিসেবে যাত্রা শুরু করলে শহুরে এলাকাগুলিতে সুইপারদেরকে কাজে লাগানো হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য ইংরেজ শাসনামলে পৌরসভার পত্তন হলে বিপুল সংখ্যক মেথরদের ভারত থেকে আনা হয়েছিল। উন্নয়ন ডিসকোর্সে মেথর সম্প্রদায়ও দলিত। তবে মেথররা এই প্রত্যয়টি কতটা আত্মস্থ করেছে, কিংবা তাঁরা দলিত হিসেবে পরিচিত হতে রাজী কি-না সেটি পর্যালোচনার দাবি রাখে।

বিতর্কিত পরিচিতি

ঢাকার মিরনজিল্লা, টিটিপাড়া ও ওয়ারী কলোনীর মেথর সম্প্রদায়ের কাছে দলিত নামকরণটি কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিচিত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিতর্কিত। তাঁরা তাদের পরিচিতি নির্মাণ করে উৎপত্তি, সংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে। দলিত পরিচয়ের চেয়ে তাদের জাতিগত কিংবা ধর্মীয় পরিচয় বেশী গুরুত্ব পায়। তাই তাঁরা কানপুরী, তেলেগু কিংবা হিন্দু হিসেবে পরিচিত হতে চায়। কানপুরী সুইপারদের একটি অংশ হরিজন নামে পরিচিত হতে চায়। মিরনজিল্লা, টিটিপাড়া, ওয়ারী তিনজায়গাতেই তাঁরা (কানপুরীরা) নিজেদের হরিজন বলে পরিচয় দিয়েছে। কানপুরী সুইপাররা তাঁদের আটটি জাতি (হাড়ি, হেলা, বাশফোড়, লালবেগী, বাল্মীকি, ডোমার, ডোম এবং রাউত) নিয়ে হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠন করেছে। হরিজন শব্দটি তাদের মধ্যে কীভাবে এল এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্যদাতা শ্যামলাল এর ভাষ্য হলঃ

> আগরতলায় আমাদের আত্মীয় আছে, তাই সেখানে নিয়মিত যাতায়াত। ওখানে হরিজন পল্লী আছে। সুইপাররা সেখানে থাকত। তাদের দেখে আমরা ঠিক করি জাতভেদ ভুলে আমরা সবাই একসাথে হরিজন হব। সে প্রায় ৭০ বছর আগের কথা- আমরা হরিজন সেবক সমিতি গঠন করি।

হরিজন কথাটি তাদের পেশাগত পরিচিতির পরিচায়কও বটে। কারো কারো কাছে "হরিজন মানে জাত সুইপার"[৩]। এই পেশাগত পরিচিতিকে তাঁরা সাংগঠনিক রূপ দিয়েছে হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠনের মাধ্যমে। পেশাগত ক্ষেত্রে হরিজন সুইপাররা যেন জাত সুইপারের চাকুরি পায় সেজন্য প্রত্যায়নপত্র দেয়া হয় হরিজন ঐক্য পরিষদ থেকে। হরিজন ঐক্য পরিষদ জাতিগতভাবে নিজেদেরকে তেলেগুদের থেকে আলাদা করছে। সেই সাথে তাঁরা হরিজনদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষা করছে। শুধুমাত্র কানপুরী সুইপারদের আটটি জাতি হরিজন ঐক্য পরিষদের সদস্য হতে পারবে। পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে মেথর সম্প্রদায় নিজেদেরকে মেথর বলে পরিচয় দেয়, নিজের সম্প্রদায় (তেলেগু-কানপুরী) অনুযায়ী পরিচয় দেয়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজের জাতি অনুযায়ী পরিচয় দেয়। একারণে কানপুরী সুইপাররা নিজেদের তেলেগু সুইপার থেকে আলাদা করছে।

কানপুরীদের মধ্যে যে আটটি জাত আছে সেই জাতের মধ্যে তাঁরা বিয়ে করে। জাতের পরিধি রক্ষা করে পঞ্চায়েত। তেলেগু সুইপারদের মধ্যেও দেখা গেছে পরিচিতির বিষয়টি পেশার সাথে জড়িত। কানপুরীরা যেমন নিজেদের হরিজন বলে পরিচয় দিচ্ছে এবং নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলেছে, তেলেগুরা তেমনি তেলেগু কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন গড়ে তুলেছে । তবে এটির কার্যক্রম এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। পেশাগত ও সম্প্রদায়গত পরিচয় ছাড়া এরা জাতিগত (এঁদের মধ্যে চারটি জাত রয়েছেঃ হল-কাপোলু, মালোলু, মাতকুলু , চাসশাবুলু) পরিচয়ও দিয়ে থাকে। পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্মও একটি বড় নিয়ামক। কানপুরীদের মধ্যে কোনো ধর্মান্তরিত ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এটি বিশেষ করে প্রযোজ্য তখন যখন তাঁরা সম্প্রদায়ের বাইরে বসবাস করে কিংবা জাত সুইপারের কাজ ছাড়া অন্য কাজ করে। অন্যদিকে তেলেগু সুইপারদের একটি অংশ খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

হরিজন (কানপুরী) সুইপাররা নিজেদের দলিত বলতে রাজী নয়। একজন কানপুরী তথ্যদাতার মতে- *দলিত মানে ভূমিহীন, দরিদ্র, যাদের মাথা গোজার ঠাঁই নেই তাঁরা। আমাদের আশ্রয় (থাকার জায়গা) আছে, আমরা দলিত নই।* ওয়ারীর তেলেগুদের মতে 'দলিত' একটি উন্নয়ন সংস্থা, যেখানে ধলপুরের তেলেগুদের কেউ কেউ কাজ করে। দলিত প্রত্যয়টি তাদের পরিচিতি নয়, বরং বাইরে থেকে আরোপিত বিষয়। অস্পৃশ্যদেরকে গান্ধী হরিজন নাম দেন। তিনি অবশ্য নিজে হরিজন ছিলেন না। হিন্দু ধর্মের সংস্কারের পক্ষে ছিলেন গান্ধী। তিনি চাইতেন হিন্দু ধর্মে সবাইকে সমান ভাবে দেখা হোক। অন্যদিকে আম্বেদকর নিজে অস্পৃশ্য ছিলেন, তিনি অস্পৃশ্যদের দলিত নামে ডাকার পক্ষপাতী। আম্বেদকর গান্ধীর হরিজন নামকরণের বিরোধিতা করেন। দেবদাসীর সন্তানদের হরিজন বা ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়। অস্পৃশ্য মেয়েরা দেবদাসী হয়, তাঁরা পতিতাবৃত্তি করে, সারা জীবন অবিবাহিত থাকে এবং পুরোহিত ও উঁচু জাতের হিন্দুদের মনোরঞ্জন করে। এই অর্থে হরিজন বলতে পিতৃপরিচয়হীনদের বোঝায়। অস্পৃশ্যদের হরিজন নামে ডাকার অর্থ তাই তাদেরকে হেয় করে দেখা, তাদের ওপর কলঙ্ক আরোপ করা।

দলিত নামটি মেথর সম্প্রদায় (কানপুরী এবং তেলেগু) পরিচিতি হিসেবে গ্রহণ করেনি। দলিত নামকরণটি যদিও বঞ্চিত ও নিস্পেষিত মানুষদের জন্য একটি একক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে; সেই সাথে এটি দলিত জনগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব পরিচিতিকে ম্লানও করছে। মেথর সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জাতিগুলি নিজেদের পরিচিতি নির্মাণে সজাগ। এক জাতি অন্য জাতি থেকে নিজেদের সীমানা নির্ধারণে বেশ সচেতন। এই সীমানার ব্যাপারটি বোঝা যায় যখন আমরা দেখি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটি প্রচলিত নয়, কিংবা এরকম বিয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত থেকে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশে

দলিত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হল এটি মূলত একটি টপ-ডাউন আন্দোলন। নিজেদের মধ্যে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় যোগসূত্র গড়ে তুলে এটি দলিত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন নিপীড়নের ঘটনা জানতে, জানাতে এবং তা রোধে চাপ প্রয়োগকারী শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে, দলিত আন্দোলনের উৎপত্তি উন্নয়ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে, দলিতদের নিজেদের মধ্য থেকে নয়। বাস্তবিক জীবনে যাদেরকে দলিত জনগোষ্ঠী বলে একই ছায়াতলে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই জনগোষ্ঠী কোনো সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়। যদিও নিষ্পেষণ এবং বঞ্চনার জায়গায় সব দলিতের অভিজ্ঞতা কম বেশি একই রকম কিন্তু এই অধস্তনতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেই সচেতনতাকে কেন্দ্র করে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে শামিল হবার ঘটনা মেথর জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না।

নিম্নবর্গের চৈতন্যঃ সম্মতি ও অশুচিতার প্রতিরোধ

বাংলাদেশের সমাজে মেথর সম্প্রদায়কে সামাজিক স্তর বিন্যাসের যে পর্যায়ে দেখা হয়, তা প্রবল শ্রেণির কিছু ভাবাদর্শ দ্বারা নির্ধারিত। প্রবল বাঙ্গালি সমাজ দলিত সমাজ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার বহিঃপ্রকাশ মূল জনগোষ্ঠী থেকে মেথর শ্রেণির মানুষের আবাস পৃথক রাখার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দলিতদের জন্য নির্দিষ্ট কলোনি করে দিয়েছে। এসব কলোনির বাইরেও বিভিন্ন বস্তিতে ঢাকার জাত-সুইপাররা থাকেন। এই বিচ্ছিন্ন বাসস্থানের মধ্যে একটি অন্যকরণ প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। এই অন্যকরণ প্রক্রিয়ার মূল বুঝতে হলে কী কী ক্ষেত্রে এরা অন্য তা বুঝতে হবে। গনকটুলীতে কমিশনারের কাছে জাত সুইপাররা সালিশ নিয়ে যাওয়ায় তিনি বলেছিলেন ঃ "তোমাদের এখানে না পোষালে তোমরা ভারতে চলে যাও"[৪]। এই উক্তিটি প্রবল বাঙ্গালি জাতিসত্তার আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ। ঢাকা পৌরসভার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করার জন্য ঔপনিবেশিক আমলে মেথরদের ভারতের উত্তর প্রদেশ, কানপুর, নাগপুর, এলাহবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আনা হয়েছিল। এলাকার নাম অনুসারে কিংবা ভাষা অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। ভিন্ন জাতিসত্তার কারণে অনেক ক্ষেত্রে এদের পোষাক (শাড়ি) পরিধানের রীতি বাঙ্গালিদের থেকে আলাদা। ভারতের সাথে এদের নানা উপায়ে যোগাযোগ এখনো আছে। এই সুইপাররা তাই প্রবল বাঙ্গালি গোষ্ঠীর থেকে ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিসত্তায় আলাদা। সেই সাথে ধর্মীয় দিক থেকে জাত সুইপাররা সংখ্যালঘু। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ কীভাবে সংখ্যালঘু অবাঙ্গালিদের 'অন্য' করে এখানে তাই দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির সমসাময়িক ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রান্তিকীকরণের জবাব দেয়া হয়েছিল বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ দিয়ে। বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির ওপর

জোর দিয়ে সেই সময় রাজনৈতিক ঐক্য খোঁজা হয়েছে। ফলে যা হয়েছে তা হল - এই জাতীয়তাবাদ প্রবল গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে আর অধস্তন কিংবা সংখ্যালঘুদের প্রান্তিক করেছে।

অন্যকরণ প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক ব্যাখ্যা করা যায় শুচি-অশুচির ধারণার মাধ্যমে। প্রবল গোষ্ঠী যেখানে মুসলমান, সেখানে মুসলমান রীতি-নীতির সাথে খাপ খায় না এমন কিছু আচার সুইপার সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় । একটি উদাহরণ হল শুকর পালন। কানপুরী সুইপারদের মধ্যে দেখা গেছে, এদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে শুকরের মাংস খাওয়া হয়। শীতলামন্দিরে কানপুরী সুইপাররা বছরে তিনটি পূজা ধলপূজা, হুলকাপূজা ও পৌষমাসের পূজা শুকরের মাংস দিয়ে উদ্‌যাপন করে। এছাড়া, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাইরে থেকে শুকর এনে সেটির মাংস বিক্রি করা হয়। কানপুরী সম্প্রদায়ের প্রিয় খাদ্য শুকর। প্রবল গোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে শুকর অশুচি (হারাম) হিসেবে চিহ্নিত, তাই যারা শুকর পালন করে তাঁরাও অশুচি। প্রবল বাঙ্গালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর অশুচির প্রতিফলন সরকারি নথিপত্রে দেখা যায়। অর্থনৈতিক কারণে সুইপার সম্প্রদায় শুকর পালন করে। অর্থাৎ এটি একটি গৃহপালিত পশু। তা সত্ত্বেও সরকারি নীতিমালায় অর্থকরী গৃহপালিত পশু হিসেবে শুকরের উল্লেখ নেই। শুকর পশুসম্পদ উন্নয়নের নীতিমালায় আছে কি না, সে সম্পর্কিত তথ্য পশুসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে পাওয়া যায় না। অথচ প্রতিবছর বাংলাদেশে ৮,৬১,০০০ শুকর উৎপাদন করা হয় যার বাজারমূল্য ৩৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

সেই সাথে মেথর সম্প্রদায় মল পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত, ফলে পেশাগত কারণেও তাঁদের অশুচি হিসেবে দেখা হয়। ম্যারি ডগলাসের মতে মানব দেহ সমাজকে তুলে ধরে। মানব দেহের সীমানাগুলি অশুচি হবার ভয় থাকে। যে-কোনো ধরনের তরল বা বস্তু (যেমন রক্ত, মল, মূত্র, ঘাম ইত্যাদি) যা দেহের সীমানার বাইরে আসে সেটি অশুচি। মানব দেহ সমাজের প্রতীক। জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে দেহের সাথে তুলনা করে তিনি বলছেন, মস্তিস্ক চিন্তা এবং প্রার্থনার কাজ করে আর তুচ্ছ অঙ্গগুলি করে বর্জ্য নিষ্কাশন করে। নীচু জাত অশুচি। তাদের কাজের মাধ্যমে তাঁরা উঁচু জাতিকে অশুচি থেকে মুক্ত রাখে। ডুমোর মতে, ধর্ম (Dharma) একটি ক্রমোচ্চ সামগ্রিক চিন্তাভাবনা (Hierarchical Ideology)। এটির একদিকে থাকে শুচি (ব্রাহ্মণ) এবং বিপরীতে থাকে অশুচি (অস্পৃশ্য)। শুচি-অশুচিকে পৃথক রাখা প্রয়োজন। একারণে বিভিন্ন জাতের কাজ আলাদা হতে হবে। তবে সেই সাথে সামগ্রিক ব্যবস্থাটি যেন টিকে থাকে সেটিও নিশ্চিত করতে হবে[৫]। জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় অশুচি হিসেবে নির্মাণের কারণে মেথর সম্প্রদায় অস্পৃশ্য, নিম্নবর্গীয়। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গ ভিন্ন ব্যাখ্যার দাবি রাখে। জাতিবর্ণ প্রথার ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি আসে হিন্দুত্ব থেকে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন

আসে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাদর্শ থেকে যে অস্পৃশ্যতার জন্ম, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান গ্রহণ করছে কেন। এ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে হবে প্রবল শ্রেণির মানসিকতায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মানসিকতা মুসলমান উচ্চবর্গের মানসিকতায় প্রবেশ করেছে। মেঘনা গুহঠাকুরতার মতে, ১৯৪৭ এর পর বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত হিন্দু জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ভারতে অভিবাসন নেয়[৬]। থেকে যায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা। যে মুসলমান অভিজাত শ্রেণি পরবর্তী সময়ে গ্রামাঞ্চলে জমির মালিক হন তাঁরা নীচু বর্ণের হিন্দুদের নীচু করে দেখার প্রথাটি বহাল রাখেন।

প্রচার মাধ্যমে মেথর সম্প্রদায়কে নিয়ে যে লেখাগুলি ছাপা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয় বেশ জোরেসোরে উঠে আসে। যেমন মেথর কলোনিগুলো অস্বাস্থ্যকর, এখানে পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা নেই, এখানে মদ-গাঁজার আসর বসে, এগুলি সন্ত্রাসীদের আখড়া ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গটি আসাদুজ্জামানের লেখায়ও এসেছে। আশেপাশের লোকেদের চিন্তাধারায় মেথরদের পরিচিতি এবং তাদের আবাসের সাথে জড়িত কতগুলি নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। নেতিবাচক ধারণার মধ্যে পঙ্কিলতা, শুকরের অবাধ বিচরণ, সুরার আসক্তি অন্যতম। এই বক্তব্যগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে 'ভদ্রলোকের' আশঙ্কা। ভদ্রলোকের ভাবনায় মেথর কলোনিগুলি হয়ে ওঠে 'অসামাজিক কার্যকলাপের' কেন্দ্রবিন্দু। ফলে কলোনিগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এমন দাঁড়ায়, যেন এগুলোর নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলিকে সমাজ থেকে দূরে রাখা হয়। এই ধারণাগুলির মধ্য দিয়ে ভদ্রলোকের চিন্তার পরিসরে মেথর সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা ফুটে ওঠে সেগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হল মেথর সম্প্রদায়ের অধস্তনতার জন্য যেন তাদের জীবনযাত্রা ও পরিবেশই দায়ী। ভদ্রলোকের ভাবাদর্শিক নির্মাণে মেথরদের মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার ব্যাপারটি বৈধতা পাচ্ছে। এটির মাধ্যমে তাঁরা যে হেজেমনি প্রতিষ্ঠা করছে, তাতে মেথর অস্পৃশ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এই ব্যাপারটি গ্রামশির তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উচ্চবর্গ কীভাবে ভাবাদর্শিক জগতে হেজেমনি তৈরি করছে। গ্রামশি হেজেমনি বা সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্বের ধারণাটির অবতারণা করেন ইতালীয় সমাজে পুঁজিবাদ বিকাশের অসম্পূর্ণতার প্রেক্ষাপটে। প্রবল শ্রেণি হেজেমনি অর্জন করে সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে। সেই সাথে তাঁরা অর্জন করে শাসক হবার নৈতিক সমর্থন ও সম্মতি। ধর্মীয় কিংবা সামাজিক হেজেমনির কারণে নিম্নবর্গ এই প্রভুত্ব স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়। সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, প্রচারমাধ্যমের ওপর প্রভাব বিস্তার করে প্রবল শ্রেণি নৈতিকতা, ন্যায্যতা ও বৈধতার মানদণ্ড তৈরি করে। তাদের তৈরি প্রতীকী পরিবেশে থেকে নিম্নবর্গ নিজেদের মুক্তির কথা ভাবতে পারে না। তাই গ্রামশি বলছেন, প্রলেতারিয়েতের দাসত্ব যতটা না তাঁর ব্যবহারে, তার থেকে অনেক বেশি তাঁর চিন্তার জগতে। তার মানে এই

নয় যে হেজেমনি সামগ্রিক। গ্রামশির মতে প্রভুত্ব ও পরাধীনতার সম্পর্কের মধ্যেও বিরোধিতা রয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় দাবি করছেন পরনির্ভরশীলতার সম্পর্কের মধ্যেও কৃষক চেতনা (নিম্নবর্গের চেতনা), সামন্ত শ্রেণির চেতনা (উচ্চবর্গের চেতনা) থেকে ভিন্ন। নিম্নবর্গ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির পুরোটি গ্রহণ করে না, বরং নিজের প্রয়োজন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কিছু উপাদানকেই বেছে নেয় মাত্র। নিম্নবর্গ মেথর সম্প্রদায় তাদের ওপর আরোপিত অস্পৃশ্যতার উপাদানগুলি পুরোপুরি মেনে নেয় না। তাদের চেতনায় যে বিরোধিতার উপাদান রয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায় তাদের বক্তব্যে।

প্রবল সংস্কৃতি তাদের ওপর কী কী নেতিবাচক প্রপঞ্চ আরোপ করে এবং মেথর সম্প্রদায় সেটির বিরোধিতা কীভাবে করে সেটি নিয়ে আলোচনা জরুরি। এরকমই একটি নেতিবাচক ধারণা সুরা-আসক্তি। প্রবল মুসলমান সংস্কৃতিতে সুরা আসক্তির ব্যাপারটিতে ধর্মীয় বাধা রয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে মুসলমানরা সুরা পান করে না। তবে মেথর সম্প্রদায়ের সুরা পানের ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। দুই লিটার পর্যন্ত সুরা পানের পার্মিট দেয়া হয় তাদেরকে। মেথর সম্প্রদায়ের মানুষরা জানে তাদের প্রতি প্রবল গোষ্ঠীর অবজ্ঞার একটি কারণ সুরা-আসক্তি। সুরাপানকে তাঁরা যেমন নিজের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখে, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে এটিকে প্রবল শ্রেণির চাপিয়ে দেয়া নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবেও ব্যাখ্যা করে। উচ্চবর্গ এবং রাষ্ট্র তাদের ওপর যে জীবন পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়েছে, এটি তারই ফলাফল। তাদের বক্তব্যগুলিতে এই বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে: "আমাদের মদ ধরিয়েছিলে ইংরেজরা," "মদ না খেলে ময়লা পরিষ্কার করব কীভাবে?" মেথর সম্প্রদায় নিজেদের পরিস্থিতির শিকার হিসেবেও তুলে ধরছে। এব্যাপারে তাদের ব্যাখ্যাগুলি এরকম: "এখনতো মুসলমানরাও মেথরের কাজ করে। জাত সুইপারের চাকুরি নাই। যাদের কাজ নাই তারা খাবে কি? এরাই তখন মদের ব্যবসা করে"; "বাইরের লোকেরাই আমাদের কলোনিতে এসে মদ খায়"। "আমাদের পার্মিট হাতিয়ে নিয়েছে মুসলমান সুইপাররা, ওরাই আমাদের নাম করে মদের ব্যবসা করে"; "লাভে ভাগ বসায় সবাই আর দোষ হয় আমাদের"। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মেথরদের মধ্যে কেউ কেউ সুরা ব্যবসার সাথে জড়িত। কিন্তু সেখানে সুবিধাভোগী বাঙ্গালিদেরও অংশগ্রহণ রয়েছে। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে পুলিশ সবাই মুনাফার অংশ পায়। কিন্তু দোষ যা হবার তা নিম্নবর্গ মেথরের হয়।

প্রবল শ্রেণির হেজেমনির আরেকটি উৎস জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ভিত্তিক ধর্মাচার। প্রবল শ্রেণি বলতে এখানে বাঙ্গালি মুসলমান নয়, বরং উচ্চবর্ণের হিন্দুকে বোঝানো হয়েছে। ডুমো এবং হার্পারের পর্যালোচনায় দেখা যায়, উঁচু বর্ণের মানুষ তার বর্ণগত অধিক শুদ্ধতার কারণে উঁচু দেবতার আরাধনা করে (High gods), তুলনামূলকভাবে যাদের

শুদ্ধতা কম তাঁরা মধ্যবর্তী দেবতার পূজা করে আর অস্পৃশ্যরা চরম অশুচি হবার কারণে অশুভ দানবের পূজা করে। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন নীচু জাতির ধর্মবিশ্বাস এক অর্থে স্ববিরোধী। কারণ, তাঁর ওপর যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সেটির বিরোধিতা করার প্রবণতা দেখা গেলেও এই বিরোধের উপাদান প্রভুর অনুকূলেই যায়। এই বিরুদ্ধতা থেকে যায় চেতনার পর্যায়ে, কর্মে রূপান্তরিত হয় না। এই স্ববিরোধী ও পরিপূরক প্রবণতার প্রমাণ রণজিৎ গুহ ডোম সম্প্রদায়ের উপাখ্যান ও পূজা-পার্বণে দেখতে পেয়েছেন। প্রবল সংস্কৃতির কাছে যারা কোনো স্বীকৃতি পায় না, সেই সব বাস্তব চরিত্র কিংবা পৌরাণিক মূর্তিকে তাঁরা ঐশ্বরিক মর্যাদায় ভূষিত করে। তিনি দেখিয়েছেন রাহু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ঘৃণার পাত্র, কিন্তু সেই রাহুই আবার ডোমদের আরাধ্য। এটি বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির প্রতি নিম্নবর্গের বিরোধিতার এক নিদর্শন। মেথররা দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা করে। মূলধারার পূজা ছাড়াও তেলেগুরা সংক্রান্তি পূজা করে থাকে, কানপুরীরা শীতলা পুজা করে। উঁচু বর্ণের মন্দিরে প্রবেশে বাধা থাকার কারণে তাঁরা নিজেরাই কলোনির মধ্যে চাঁদা তুলে মন্দির তৈরির ব্যবস্থা করেছে। কানপুরী এবং তেলেগু সুইপার কলোনিতে শিবমন্দির আছে, রামমন্দির রয়েছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে যদিও তাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারছে, উঁচু বর্ণের বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে তাঁরা মুক্তি পাচ্ছে না। তথ্যদাতা সাবিত্রী রানির মতে:

> শিবরাত্রিতে আমরা যখন মন্দিরে গেলাম, তখন দেখি আমাদের প্রসাদের প্যাকেটটি অপরিষ্কার। অন্যদের পরিষ্কার প্যাকেটে প্রসাদ দেয়া হচ্ছিল আর আমাদের দেয়া প্যাকেটগুলি ছিল নোংরা। খাওয়া হয়ে গেলে যে প্যাকেটগুলি ফেলে দিচ্ছিল, সেইগুলি কুড়িয়ে আমাদের প্রসাদ দেয়া হচ্ছিল।

এপ্রসঙ্গে তথ্যদাতা সাবরী রানীর বক্তব্যঃ

> আগে ব্রাহ্মণ আমাদের মন্দিরে এসে পজা করতে চাইত না। আসলেও মন্দিরের ভেতরে ঢুকত না। আমাদের সাথে যেন ছোঁয়া না লাগে সেভাবে পূজা করে চলে যেত। এখন ওদের টাকা দরকার, টাকা দিলে পূজা করে।

তথ্যদাতা গোপাল চন্দ্রের ভাষায়ঃ

> যে পুজায় মন্ত্র পড়তে হয় সেই পূজা আমরা করতে পারি না, তখন ব্রাহ্মণকে ডাকতে হয়। কারণ দেবতার কাছে কোনটার পর কোনটা চড়াতে হয় আমরা সেসব জানি না। পূজা শুদ্ধ হবার জন্য ব্রাহ্মণ দরকার, তবে ব্রাহ্মণ আমাদের কাছে আসতে বেশি টাকা দাবি করে।

উচ্চবর্গের দেবতা থেকে সুইপাররা নিজেদের সরিয়ে নেয়নি। বরং তারা দেবতার আরাধ্যে উচ্চবর্ণকে কাজে লাগাচ্ছে। ব্রাহ্মণ অর্থের বিনিময়ে তাদের পূজা করে, এই উক্তির মাধ্যমে উচ্চবর্ণের প্রতি একধরনের তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে তারা। আবার সেই

সাথে ব্রাহ্মণ তাদের কাছে অনেক উঁচু। এতে করে তাদের চৈতন্যের দ্বৈততা প্রকাশ পাচ্ছে। একজন তেলেগু তথ্যদাতার মতে :

> ভগবান বলেছে সবাই এক, কোনো বড় ছোট জাত নেই, মানুষই ছোট-বড় বানায়। আমিও মানুষ, আমার গায়ে কি লেখা আছে আমি মেথর? ব্রাহ্মণ পূজা দিতে না আসলে নিজেদের মধ্যে থেক একজন পুরোহিত হয়ে আমরা পূজা দেই।

এসব বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উঁচু জাতের চাপিয়ে দায়া ধর্মীয় ভাবাদর্শের সাথে তাঁরা (মেথর) নিজেদের ধর্ম চর্চাকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এটি বোঝা যায় কলোনির মধ্যে মন্দির স্থাপন কিংবা ব্রাহ্মণের মাধ্যেম পূজা করার ব্যাপারটির মাধ্যমে। সুতরাং তাদের চৈতন্যে বিরোধিতার উপাদান রয়েছে। কিন্তু, তাঁরা প্রবল শ্রেণির প্রতি প্রকাশ্য বিরোধিতা প্রকাশ করে না।

মোফ্ফাত জাতিবর্ণ দ্বারা নির্ধারিত পেশাকে ধর্ম বলছেন। সেই অর্থে মেথরের কাজই তাঁর ধর্ম । মেথর সম্প্রদায় তাদের পেশার জন্য ধর্মকে দায়ি করেনা। বরং তাদের পেশার জন্য তারা ইংরেজ আমলের নীতিকে দায়ী করছেন। ইংরেজ সরকার মেথর সম্প্রদায়কে তাদের কাজে অভ্যস্তকরণের জন্য মদে আসক্ত করে। কানপুরী সুইপার শ্যামলের মতে,

> মিরনজিল্লা সুইপার কলোনি ২৫০ বছরের পুরনো। পূর্বপুরুষের কাছে শুনেছি ইংরেজ আমলে সন্ধ্যার দিকে গাড়িতে করে বড় বড় ড্রাম ভর্তি করে মদ পাঠানো হত। সাথে থাকতো রেশন ও চা। তখনকার সময় এখনকার মত স্যানিটারি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল না। বড় বড় হাড়িতে করে খালি হাতে মল পরিষ্কার করা হত, আর গরু গাড়িতে করে সেই মল নিয়ে যাওয়া হত।

প্রবল সংস্কৃতির চাপিয়ে দেয়া নেতিবাচক ব্যাপারগুলির প্রতি মেথর সম্প্রদায়ের চৈতন্যে বিরোধিতার উপাদান থাকলেও যেই মেথরের কাজের জন্য তাদের এত বঞ্চনা, সেটি হারানোর ভয় তাদের রয়েছে। এটি প্রবল ভাবাদর্শের প্রতি সম্মতির বহিঃপ্রকাশ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমানরা সুইপারের চাকুরি পেতে থাকে। এরশাদের শাসনামলে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। এছাড়া চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি রয়েছে। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে নিয়োগকৃত ১০০০ সুইপারের মধ্যে ৭০০ জনই ছিলেন মুসলমান। দলিত সংগঠনগুলি জাতসুইপারদের জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে ৮০% কোটা রাখার দাবি করছে। জাতিবর্ণব্যবস্থার চাপিয়ে দেয়া এবং ইংরেজ কর্তৃক প্রলোভনের স্বীকার হয়ে তাঁরা যে নীচু কাজ করছে, সেই কাজ ধরে রাখার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ, দেনদরবার কি কপট চৈতন্যের পরিচায়ক? গ্রামশি ভাবাদর্শিক আধিপত্যকে হেজেমনি বলেছেন। শাসক শ্রেণি মেথরদেরকে নীচু কাজে অভ্যস্ত

করিয়েছে এবং এজন্য জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছে। গ্রামশির মতে মতাদর্শিক অধস্তনতাই কাঠামোগত পরিবর্তনের পথে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে। শ্রমজীবী শ্রেণি বেশিরভাগ চিন্তাই প্রবল গোষ্ঠী থেকে পেয়ে থাকে। একারণে নিজের অবস্থা সম্পর্কে তাদের খণ্ডিত ধারণা তৈরি হয়। প্রবল গোষ্ঠীর সামাজিক বিন্যাসের প্রতি তারা এক ধরনের সম্মতি জ্ঞাপন করছে যাকে কপট চৈতন্য বলা যেতে পারে। তবে মেথর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এটি কতটা কপট চৈতন্য তা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

প্রবল গোষ্ঠীর হেজেমনির প্রতি সম্মতি জানানোর কারণগুলি তাদের জীবনযাত্রার উপাদানগুলির সাথে জড়িত। মেথর কলোনিগুলিতে এক কামরায় তিন প্রজন্মের বসবাস, ব্যক্তিগত জীবনের আলাদা কোনো জায়গা নেই, সেই পরিবেশে লেখাপড়া করা সহজ নয়। লেখাপড়া করে ভবিষ্যৎ ভাল হবে এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই। ঠিকানা হিসবে মেথর পট্টি দেখলে কিংবা মেথর পরিচয় জানলে কোনো 'ভদ্র' চাকুরি মেথররা পান না। তাই বেশিরভাগ ছেলেই মাধ্যমিক শেষ করে না। তাদের লক্ষ্য থাকে কীভাবে সরকারি দপ্তরে একটি মেথরের চাকুরি যোগাড় করা যায়। কারণ কলোনির মানুষের কাছে সরকারি চাকুরির গুরুত্ব বেশি। সরকারি চাকুরি থাকলে বাসস্থানের নিরাপত্তা থাকে, সেই সাথে সহজ শর্তে মহাজনের ঋণ পাওয়া যায়। যারা আরেকটু লেখাপড়া করছে, এস এস সি পাশ করছে, তাদের অভিজ্ঞতা হল সুইপার পরিচয়ে কোনো অফিসে সুইপার ছাড়া অন্য কোনো চাকুরি পাওয়া সম্ভব নয়। ওয়ারী সুইপার কলোনির মোহন সামুনের ভাষায়:

> আমি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি,একটি বেসরকারি সংগঠনের স্কুলে পড়াই, কিন্তু এই চাকুরির কোনো দাম নেই, কারণ কলোনিতে নতুন বিল্ডিং উঠছে, সেখানে সরকারি চাকুরেদের ঘর দেবে, অন্যরা উচ্ছেদ হবে। বিভিন্ন অফিসে কম্পিউটার অপারেটরের পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় বার বার বাদ পড়ি, কারণ ভদ্রলোকদের অফিসে মেথর টেবিল চেয়ারে বসে কাজ করবে সেটা মানা যায় না।

মেথরের চাকুরি থাকলে থাকার জায়গা থাকে। একারণে সুইপার কলোনিতে পরবর্তী বংশধর সুইপার হবার প্রচেষ্টাই করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। ঢাকায় সুইপারদের থাকার জায়গার মালিক সিটি কর্পোরেশন। যারা সরকারি চাকুরি করে তাদের জন্য ঘর বরাদ্দ, আর যাদের চাকুরি নেই তাঁরা থাকে আত্মীয়তার সূত্রে। অবসর নেয়ার পরও কলোনীর বাসাটি হাতছাড়া হয়না। পরিবারের কেউ না কেউ চাকুরিতে ঢোকে। কখনও সেটি হয় উৎকোচের বিনিময়ে। কলোনিগুলোতে পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপ্রতুল। থাকার জায়গা বাড়ানোর উপায় নেই। উপরন্তু, পেশাগত পরিচয় এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের নীচু অবস্থানের কারণে কলোনির বাইরে বাসা ভাড়া করে থাকাও সম্ভব হয় না। সরকারি ঘরের বরাদ্দ পেতে দেন-দরবার করতে হয় প্রভাবশালীদের সাথে। নতুন

তৈরি বিল্ডিংগুলিতে কাদের ঘর দেয়া হবে সেটি নির্ভর করবে নেতৃস্থানীয়দের সাথে সুসম্পর্কের ওপর। সীমিত সম্পদ নিয়ে তাই রয়েছে প্রতিযোগিতা। এই প্রসঙ্গে একজন কানপুরী সুইপারের ভাষ্য:

> আমি চাই আমার ছেলে লেখাপড়া শিখুক ভাল চাকুরি করুক। আমার সন্তান মেথর হোক আমি সেটা চাই না। কিন্তু যারা স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেনি, তাদের জন্য মেথরের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। মেথরকে সমাজ অন্য কাজ করতে দেয় না। আমাদের কাজ মুসলমানরা নিয়ে নিলে আমাদের কি হবে?

নিম্নবর্গের বেঁচে থাকার উপাদানগুলো সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করছে। নিম্নবর্গের কাছে তাই এগুলি রক্ষা করার নামান্তর হল বেঁচে থাকা। গ্রামশি বলেছেন, ভাবাদর্শিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে উচ্চবর্গকে নিম্নবর্গের সম্মতি আদায় করতে হবে। এর মাধ্যমে নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। তবে হেজেমনি অর্জন করতে হলে আরেকটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। আর সেটি হল প্রবল শ্রেণির হেজেমনিক সামাজিক ব্যবস্থায় নিম্নবর্গকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। গ্রামশির এই বক্তব্যের সাথে মেথর সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছু মিল পাওয়া যায়। চাকুরির সাথে সাথে তাদের বাসস্থানের সুবিধা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সীমিত সংখ্যক চাকুরি নিয়ে মুসলমান সুইপারদের সাথে রয়েছে প্রতিযোগিতা। মেথর সম্প্রদায়ের প্রধান দাবি চাকুরির নিশ্চয়তা। যেই মেথর পরিচয়ের জন্য তাদের বঞ্চনা, সেই মেথরের কাজের জন্য তাদের আকুতি কি কপট চৈতন্য (False Consciousness)? কপট চৈতন্যের চেয়ে বরং এটিকে বলা যায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে নেয়া বাস্তব সিদ্ধান্ত।

তবে সম্মতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি, নিজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে এরা সামাজিক স্তর বিন্যাসে ওপরের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মেথর পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে বোর্ডিং স্কুলে রেখে কিংবা ভারতে পাঠিয়ে। অনেকে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে ইউরোপেও পাড়ি জমিয়েছে। মেথর সম্প্রদায়ের মানুষদের এই প্রচেষ্টা প্রমাণ করছে যে, প্রবল শ্রেণির চাপিয়ে দেয়া অস্পৃশ্যতাকে তারা পুরোপুরি মেনে নেয় না। বরং নিজের জীবনবোধ ও বাস্তবতা অনুযায়ী সেটি মানিয়ে নেয় এবং অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। তবে এই প্রচেষ্টাগুলি নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিকভাবে মেথর সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয় অবস্থার উত্তরণে তেমন ভূমিকা রাখে না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মেথর সন্তানরা প্রবল শ্রেণির ভাবাদর্শ আত্মস্থ করছে। মেথর পরিচয় থেকে তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। ফলে মেথর সম্প্রদায়ের সাথে তাদের মৌলিক ও কাঠামোগত সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ছে। নিজের গোষ্ঠীকে দিকনির্দেশনা দেবার, তাদের চৈতন্য তৈরি করার কিংবা তাদের সংগঠিত করার

ব্যাপারটি তারা করছেন না। নিম্নবর্গের বোধবুদ্ধি খণ্ডিত, কারণ এটি জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা তৈরি করে না। বাইরে থেকে উন্নত কোনো দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিয়ে এটি পরিবর্তন করা যায় না। কারণ এতে নিম্নবর্গ আরো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। হেজেমনি অর্জনের জন্য প্রয়োজন যৌগ বুদ্ধিজীবী। কারণ যৌগ বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমেই নিম্নবর্গ চৈতন্য পাবে। যৌগ বুদ্ধিজীবীদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির সাথে মৌলিক ও কাঠামোগত সম্পর্ক রয়েছে। যখন একটি শ্রেণি নিজের স্বার্থ রক্ষায় সংগঠিত হয়, তখন সেটি আর পষধংং রহ রঃংবষভ থাকে না, সেটি হয়ে ওঠে *class for itself*। এই চৈতন্যটি আসে যৌগ বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে। বুদ্ধিজীবীকে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না, বরং তত্ত্বের সাথে সাধারণ মানুষের অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। গ্রামশি যৌগ বুদ্ধিজীবীকে দেখতে চেয়েছেন বাস্তব জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে। কিন্তু মেথর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়টি দেখা যায়নি। মেথররা নিজেদের মধ্যে সংগঠন করেছে, ক্লাব করেছে, তাদের পঞ্চায়েত আছে। এই সংগঠনগুলি তাদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা রক্ষা করে, কলোনির আইন শৃংখলা রক্ষা করে। মেথরদের মধ্যে একটি অংশ প্রবল শ্রেণির ভাবাদর্শ গ্রহণ করে পেশাগত নিশ্চয়তা নিয়ে ব্যস্ত, অন্য অংশটি ব্যক্তিগত ভাবে সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। সমন্বিত মেথর চৈতন্য সৃষ্টির নজির এদের মধ্যে নেই। ফলে তাদের নিম্নবর্গীয় অবস্থার পুনরুৎপাদন ঘটছে।

মেথর সম্প্রদায়ের সমন্বিত চেতনা গঠনের পথে বাধা জাতিগত বিভক্তি ও শ্রেণিভিত্তিক শোষণ। মিরনজিল্লা , টিটিপাড়া ও ওয়ারীর মেথর জনগোষ্ঠী মূলত তেলেগু ও কানপুরী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত । তেলেগু ও কানপুরী সম্প্রদায় নিজেরাও মধ্যে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। রীতিনীতি, জীবনযাত্রা, ভাষা, উৎপত্তিগত দিক থেকে এরা নিজেদের আলাদা করে। তবে এরা পেশাভিত্তিক অধস্তনতা, সমাজের অস্পৃশ্যতা ও অশুচিতার দিক থেকে একই অবস্থার শিকার। তেলেগু সুইপার সম্প্রদায় - কাপোলু, মালোলু, মাতকুলু চাসশারুলু এই চারটি জাতে বিভক্ত। এই জাতগুলির মধ্যে আবার ক্রমোচ্চতার ব্যাপার রয়েছে। কাপোলুর মতে উঁচু থেকে নীচুতে ক্রমটি এরকম : কাপোলু, মালোলু, মাতকুল এবং চাসশারুলু। তবে এই ক্রমটি সর্বজনস্বীকৃত নয়। চাসশারুলুর মতে মালোলু এবং মাতকুলু দুটিই ছোট জাত। কাপোলুকে উঁচু জাত বলে মেনে নিলেও মালোলু মাতকুলু এবং চাসশারুলুদের মধ্যে কে বড় কে ছোট এই নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। চাসশারুলু একজন নারী তথ্যদাতার মতে ক্রমটি এরকম- কাপোলু, চাসশারুলু, মালোলু এবং মাতকুলু। কাপোলু বড় জাত এটি তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায়, যেমন, কলচেপে পানি নেবার সময় অন্যজাতের কেউ কল ধরলে কাপোলু কলের হাতলটি ধুয়ে পানি নেয়। এছাড়াও কাপোলুরা নীচু জাতের হাতে খায় না কিন্তু কাপোলুর হাতের খাবার অন্যরা খায়। মালোলু চাসশারুলুর হাতে খায় না। চাসশারুলু সবার হাতে

খায়। নিজ জাতের মধ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও বিয়ে হয় এবং সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, কিন্তু ভিন্ন জাতের মধ্যে ধর্ম এক হলেও পঞ্চায়েত বিয়েতে বাধা দেয়। আসাদুজ্জামানের মতে, এদের মধ্যে জাতিগত ক্রমোচ্চতার ব্যাপারটি ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং এটি জাতিসত্তার ব্যাপার। কৌশলত সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণই ক্রমোচ্চতার মাপকাঠি। কানপুরীদের মধ্যেও বিভিন্ন জাতি রয়েছে। এরা মূলত আটটি গোত্রে বিভক্ত: হাড়ি, হেলা, বাশফোড়, লালবেগী, বাল্মিকী, ডোমার, ডোম এবং রাউত। এদের মধ্যেও উঁচু-নীচু রয়েছে। ডোমদের নীচু বলে দেখা হচ্ছে কারণ এরা অপরিচ্ছন্ন থাকে আর হেলা উঁচু কারণ ভারতে তারা সম্পদশালী। অন্যদিকে সুইপারদের থেকে মুচিদেরকে নীচু জাত বলে ধরা হয়। তবে এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছনো যায়নি, কারণ অন্য এক সাক্ষাৎকারে দেখা গেছে মুচি (রবিদাস) সুইপারদের নীচু জাত ভাবে। মোফ্ফাত দেখাচ্ছেন মূল জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় যেমন ক্রমোচ্চতা আছে, তেমনি অস্পৃশ্যদের নিজেদের জাতিগুলির মধ্যেও ক্রমোচ্চতা আছে। বেরেম্যান এর মতে অস্পৃশ্যরা জাতিবর্ণ ব্যবস্থা মেনে নিলেও জাতিবর্ণ ক্রমে নিজেদের অবস্থান মেনে নেয় না। কোনো জাতই নিজেকে নীচু বলে মেনে নিতে চায় না। ধর্মান্তরিত হবার কারণে আরেক ধরনের বিভাজন লক্ষ করা যায়। কানপুরীদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হবার ঘটনা পাওয়া না গেলেও তেলেগুদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার উদাহরণ রয়েছে। টিটিপাড়ায় গীর্জা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলে সামাজিক সংহতি নষ্টের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মেথর মহাজন ও সুরাব্যবসায়ীরা সুইপারদের শোষণ করছে। যারা তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন তাঁরা কলোনিতে সুদে টাকা খাটায়। এক লক্ষ টাকা ১৫ কিস্তিতে মাসে ১০ হাজার টাকা করে সুদ দিতে হয়। অর্থনৈতিক লেনদেন উঁচু এবং নীচু শ্রেণির সুইপারদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ । এর প্রতিরোধে কলোনির সুইপাররা এখন নিজেরাই সমিতি করে টাকা সঞ্চয় করছে। জাতিগত বিভক্তি ও শ্রেণিভিত্তিক শোষণ সমন্বিত মেথর চৈতন্য তৈরির পথে বাধা। ডেভিড আর্নল্ড দেখিয়েছেন অসমন্বিত চেতনা (Lack of collective consciousness) এবং বিচ্ছিন্নতা নিম্নবর্গের ভাবাদর্শের দুটি প্রধান দিক। নিম্নবর্গের অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক লক্ষ এবং চেতনার স্তর সমজাতীয় নয়। ফলে তাদের আদর্শগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী ।

মেথর সম্প্রদায় যেহেতু সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য তাই তাঁদের নিম্নবর্গীয় অবস্থার উত্তরণের সাথে প্রবল শ্রেণীর অস্পৃশ্যতার মতাদর্শ পরিবর্তনের ব্যাপারটি জড়িত। বেইলী ভারতের উরিষ্যা রাজ্যে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সম্পর্কে গবেষণা করেন। সেখানকার অস্পৃশ্য জাতি বোড আউটকাষ্ট সরকারী নীতির কারণে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয় এবং পরবর্তী সময়ে গ্রামের মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। বেইলী মনে করেন অস্পৃশ্য বোড আউটকাষ্টদের উদ্দেশ্য

সফল না হবার কারণ তাদের অশুচি। আম্বেদকর মত প্রকাশ করেছিলেন জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে অস্পৃশ্যদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আম্বেদকর চেয়েছিলেন অস্পৃশ্যরা যেন রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তাদের লক্ষ অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষিত করতে। গান্ধী ১৯৪৫ সালের দিকে আম্বেদকরের সাথে একমত প্রকাশ করেন, তিনি শিক্ষিত হরিজনদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথা বলেন গ্রামশি যৌগ বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজনীয়তার সাথে সাথে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেথর সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ সীমিত। তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূল ধারা রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী পর্যায়ে অংশগ্রহণ পর্যন্তই। মেথর চৈতন্যকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায়নি।

শেষ কথা

২০০০ সালের পরের দিকে দলিত প্রত্যয়টি উন্নয়ন ডিসকোর্সে জায়গা করে নেয় । উন্নয়ন ডিসকোর্সে বাংলাদেশের অস্পৃশ্য বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসা হয়েছে একই কাতারে, নাম দেয়া হয়েছে দলিত। সেই অর্থে উন্নয়ন ডিসকোর্সে মেথরও দলিত। এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে মেথর সম্প্রদায়ের কাছে দলিত প্রত্যয়টি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া একটি প্রত্যয়। বাস্তব জীবনে মেথর সম্প্রদায় নিজেকে দলিত বলে পরিচয় দিতে নারাজ - তাঁরা কানপুরী কিংবা তেলেগু, তাঁরা মেথর, কিন্তু তাঁরা দলিত নয়। পরিচিতি নির্মাণে যে বিষয়টি তাদের কাছে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটি হল তাদের সম্প্রদায়গত ও পেশাগত পরিচিতি। সেই সাথে এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে মেথের সম্প্রদায়ের চৈতন্যের কী কী উপাদান তাদের নিম্নবর্গীয় অবস্থার পুনরুৎপাদন করছে । জাতিগত বিভক্তি ও শ্রেণিকরণের কারণে মেথর সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য লক্ষ করা যায় না। যারা লেখাপড়া শিখে সামাজিক সচলতার মাধ্যমে ওপরে উঠেছে, তাঁরা নিজেদের পরিচয় গোপন করেছে, স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য দিক নির্দেশক কিংবা সংগঠক হিসেবে কাজ করেনি। এরা বরং প্রবল শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নতি স্বীকার করেছে। ফলে ভাবাদর্শিক নেতৃত্ব দেবার মত যৌগ বুদ্ধিজীবী এখানে তৈরি হতে পারছে না। জাতিগত বিভক্তি, সীমিত চাকুরির প্রতিযোগিতা, শ্রেণিভিত্তিক শোষণ তাদের সমন্বিত মেথর চৈতন্য তৈরির পথে বাধা। এই প্রবন্ধে আরো দেখানো হয়েছে মেথর সম্প্রদায় তাঁদের চৈতন্যে দ্বৈততা লালন করে। একদিকে তাঁরা প্রবল শ্রেণির চাপিয়ে দেয়া অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধ করে, অন্য দিকে মেথর পেশা রক্ষার জন্য আকুতি প্রকাশ করে। মেথর সম্প্রদায় অস্পৃশ্য এবং নিম্নবর্গ কারণ জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় তাঁরা নীচু এবং সেই সাথে জাতিসত্তায় ও সংস্কৃতিতে অন্য। তাই বলে নিম্নবর্গ তাদের অস্পৃশ্যতা

মেনে নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না। বরং এরা সক্রিয়ভাবে ধর্মাচার করে। এক্ষেত্রে তারা সাহায্য নেয় ব্রাহ্মণের। ধর্মাচারের পালনের যে বাধা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটির প্রতি তাদের নীরব প্রতিরোধ দেখা যায় নিজেদের মন্দির স্থাপন করার ঘটনায়। তাদের চেতনায় তারাও মানুষ, তারাও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু সেই সাথে তারা মেথর পেশার নিশ্চয়তাও চায়। গ্রামশির মতে নিম্নবর্গ তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করে। নিম্নবর্গের চেতনা তাই খণ্ডিত। একদিকে জীবিকা ও বাসস্থানের নিরাপত্তার কারণে তারা বংশপরম্পরায় মেথরের কাজের স্বীকৃতি চায়, অন্যদিকে, উঁচু বর্ণের আরোপিত ধর্মীয় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাদের রয়েছে ধর্মাচার পালনের আকাঙ্ক্ষা। নিম্নবর্গের চেতনায় তাই একদিকে রয়েছে জীবনে ধারণের বাস্তব উপকরণ রক্ষার প্রচেষ্টা যা কিনা ঐতিহাসিকভাবে প্রবল গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া অস্পৃশ্য পেশা ধরে রাখার চেষ্টা, অন্য দিকে রয়েছে ধর্মীয় অশুচিতার বিরুদ্ধে নিজেদের নীরব প্রচেষ্টা।

কৃতজ্ঞতা

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নাসিমা সুলতানা, সহকর্মী লোপামুদ্রা রহমান, অভী চৌধুরী, ফাতেমা সুলতানা শুভ্রা, এবং মো: মিজানুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের মতামত জানানোর জন্য। কম্পিউটার কম্পোজে সাহায্য করার জন্য নৃবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আমিনুর রহমানকে ধন্যবাদ।

টীকা:

---

[১] মিশেল ফুকোর মতে ডিসকোর্সকে দেখতে হবে এমন একটি পরিবেশনের ব্যবস্থা হিসেবে যার মধ্যে অনুশীলন সমন্বিত হয় এবং অর্থ তৈরী হয়। ডিসকোর্স বলতে তিনি বুঝিয়েছেন বক্তব্যের সমষ্টিকে; আবার কখনো বুঝিয়েছেন সেই নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনকে যা কিনা বক্তব্য সৃষ্টি করে (Michael Foucault, *The Archaeology of knowledge, Routledge, London,*2002, p,80), এই বক্তব্য এবং অনুশীলনগুলি কোনোভাবেই এলোমেলো নয়, বরং এগুলির অর্থ ও ফলাফল রয়েছে। নিয়ন্ত্রিত অনুশীলন বলতে ফুকো সেই অন্তর্নিহিত নিয়মগুলির কথা বলেছেন, যেগুলি অনুসরণ করে বক্তব্য তৈরি হয় (বিস্তারিত দেখুন : Sara Mills, *Michael Foucault,* Routledge, London,2003, p,53) ডিসকোর্স আমাদেরকে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার কাঠামো প্রদান করে (প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৫)। এস্কোবার উন্নয়ন ডিসকোর্সকে দেখেছেন একটি ব্যবস্থা হিসেবে। এই ব্যবস্থাটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কৌশল, বস্তু এবং ধারণার জন্ম দেয়। সেই সাথে ডিসকোর্স ঠিক করে দেয় কী চিন্তা করা যাবে কিংবা কী বলা যাবে (Arturo Escobar,

Encountering Development: the making and unmaking , Princeton University Press *of the world* , Princeton University Press, New Jersey:, 1995, p, 40)।

[২] বৃটিশ আমলে ভারতের 'নীচু' জাতিগোষ্ঠীর নামকরণ কী হবে সে প্রসঙ্গে বিস্তর বিতর্ক চালু ছিল। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত নিষ্পেষিত শ্রেনি প্রত্যয়টির উল্লেখ বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রে পাওয়া গেছে। ১৯০৯ সালে 'অস্পৃশ্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৬ সালে বৃটিশ সরকার অস্পৃশ্য জাতিবর্ণের একটি তালিকা (Schedule) তৈরী করে। ভারতের আইনে বৃটিশ আমলে তৈরী করা সেই তালিকার ভিত্তিতে এখনও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত জাতিগোষ্ঠী (Schedule Caste) বলা হয়ে থাকে। বিস্তারিত দেখুন, Clifford Bob," "Dalit Rights are Human Rights": Caste Discrimination, International Activism and the Construction of a new Human Rights Isse", *Human Rights Quarterly,* Vol, 29, 2007, p. 168.

[৩] যারা বংশ পরম্পরায় মেথরের কাজ করে তাঁদের জাত সুইপার বলা হয়েছে।

[৪] সাক্ষাৎকার, মনি রাণী দাস, বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত অধিকার আন্দোলন, ২১ মার্চ, ২০১৩।

[৫] এ সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দেখুন Dumont (1970) in T. N. Madan, " Dumont on the Nature of Caste in India", in Dipankar Gupta (ed), *Social Stratification,* Oxford University Press, New Delhi, 1991, p.76

[৬] মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সাক্ষাৎকার, ২৫/৪/২০১৩।

তথ্যসূত্র

Asaduzzaman, A 2001, *The 'Pariah' People : An Ethnography of the Urban Sweepers in Bangladesh,* University Pres Limited, Dhaka.

Arnold, D 1984 'Gramsci and peasant subalternity in india', *The Journal of Peasant Studies,* vol. 11, no. 4 ,pp. 155-177.

Bailey, F.G., 1957, *Caste and the economic frontier: a village in highland Orissa,* Manchester University Press, Manchester.

Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement, n.d., *Work Statement Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement Work Statement, April 2008-June 2011,* BDERM, Dhaka.

Bob, C 2007, Dalit Rights are Human Rights: Caste Discrimination, International Activism and the Construction of a new Human Rights Issue, *Human Rights Quarterly*, vol, 29, pp. 167-193.

Chowdhury, I. U. 2009. *Caste Based Discrimination in South Asia: A Study of Bangladesh*. Working Paper Series, Volume III, Number 07.Indian Instiute of Dalit Studies, New Delhi.

Coward, H. 2003, Gandhi, Ambedkar, and Untouchability In Harold Coward (ed), *Indian Critiques of Gandhi*, State University of New York Press, Albany, pp. 41-66.

Crehan, Kate A.F 2002, *Gramsci, Culture, and Anthropology*, Pluto Press, London.

Deliege, R 1992, Replication and Consensus: Untouchability, Caste and Ideology in India, *Man*, vol. 27, no. 1, pp. 155-173.

Douglas, M 1966, *Purity and Danger an analysis of the concepts of Pollution and Taboo*, Routledge, New York.

Green, M. E. and Ives, P. 2009, Subalternity and Language: Overcoming the Fragmentation of Common Sense, *Historical Materialism*, vol. 17, pp. 15-16.

Guha, R 1988, Preface In Ranajit Guha and Gayatri Chakravorty Spivak (eds) *Selected Subaltern Studies*, Oxford University Press, Oxford, pp 35-36.

Guhathakurta M. and Begum, S., 2008, From Research to Dalit Rights, *Annual Report (2007-2008)*. Research Initiatives, Bangladesh, Dhaka.

Gupta, Dipankar 2005, Caste and Politics: Identity over system, *Annual Review of Anthropology*, vol. 34, pp, 409-42.

Leslie, J 2003, *Authority and Meaning in Indian Religions: Hinduism and the Case of Vālmīki*, Ashagte Publishing Company, Aldershot.

Madan, T.N 1991, Dumont on the Nature of Caste in India In Dipankar Gupta (ed), *Social Stratification*, Oxford University Press, New Delhi, 1991, pp. 74-83.

Masud, M.R 2006, The Life and Days of (Dalit) Sweepers in Bangladesh Dirtiness, grabage, bad smell and nasty bio-products are part of their lives, viewed 2 September 2014, http://www.dalits.nl/060424.html

Moffatt, M 1975, Untouchables and the caste system: a Tamil case study, *Contributions to Indian Sociology*, vol. 9, no.1, pp, 111-122.

Mohsin, A. 2002, *The Politics of Nationalism The Case of the Chittagong Hill Tracts Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka.

Scott, J. C 1985, *Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*, Yale University press, London.

Smith, K. 2010 Gramsci at the margins: subjectivity and subalternity in a theory of hegemony, *International Gramsci Journal*, vol. 1, no. 2, pp, 39-50.

Sivaramakrishnan, K 1995, Situating the Subaltern: History and Anthropology in the subaltern studies project, *Journal of Historical Sociology* vol 8, no 4, pp, 395–429.

Sunder R., Rajeswari 2012 Questioning Intellectuals: Reading Caste with Gramsci in Two Indian Literary Texts In Neelam Srivastava, Baidik Bhattacharya (eds) *The Postcolonial Gramsci*, Routledge, New York, pp. 165-190.

Zene, C. 2011, Self-Consciousness of the Dalits as 'Subalterns': Reflections on Gramsci in South Asia In Marcus E Green, (ed.), *Rethinking Gramsci*, Routledge, London, pp. 90-104.

ইসলাম, মাজহারুল ২০০৯, মানবাধিকার সংগ্রামের নতুন কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে দলিত সমাজ, *মানবাধিকার বর্ষপত্র*, নীতি গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

গুহ, রণজিৎ ১৯৯৮, একটি অসুরের কাহিনী, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কোলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ১৯৯৮, ভূমিকাঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ, কোলকাতা।

পারভেজ, আলতাফ., ইসলাম, মাজহারুল., ও দাস, মনি রাণী ২০০৮, *অস্পৃশ্যতা দারিদ্র ও পুরষতন্ত্রঃ বাংলাদেশে দলিত নারীর বিপন্নতা*, বাংলাদেশ দলিত হিউম্যান রাইটস, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।

বিল্লাহ, এ এস এম মাসুম ২০১২,বাংলাদেশে দলিত বিপন্নতা: সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের স্বরূপ সন্ধান, *নাগরিক উদ্যোগ সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (অক্টোবর-ডিসেম্বর)*, নাগরিক উদ্যেগ, ঢাকা।

রহমান, মোঃ মজিবুর ২০০৬, মেথর ও কাওরা সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য বিমোচনে শুকর চাষঃ একটি গণগবেষণা, *উন্নয়ন কর্মসূচিতে অবহেলিত জনগোষ্ঠী*, রিসোর্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ, ঢাকা।